SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস: বাঁকুড়ার জনজীবন ও সংস্কৃতির চালচিত্র

Dr. Arup Palmal
Assistant Professor
Dept. of Bengali & literature
Govt. General Degree College Gopiballavpur-II
Beliaberah, Jhargram, West Bengal, India
Email: arup.palmal1984@gmail.com

Abstract: বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে রামকুমার মুখোপাধ্যায় বর্তমানে এক উজ্জ্বল নাম। তিনি অন্ত্যজ মানুষকে নিয়ে যে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তা কথাসাহিত্যের সৃজন-বিশ্বে একেবারেই ভিন্ন স্বর-স্বরান্তের ব্যঞ্জনা দেয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার জনজীবন এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহকমূলক উপন্যাসগুলি আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চারণে প্রান্তরে (১৯৯৩) গরুর পাল নিয়ে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো রাখালিয়া জীবন নিয়ে রচিত এই উপন্যাস। একটি বা দুটি শিশুর সারল্যমধুর ছেলেবেলা থেকে বয়ঃপ্রাপ্তির রুঢ় পৃথিবীতে উত্তরণের বৃত্তান্ত। আবার, উপন্যাসটি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রাগত পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের নথি। বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত 'দুখে কেওড়া' (২০০২) রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিনব উপন্যাস। পুরো উপন্যাসটি দুখের সংলাপ দিয়ে গড়া। দুখে কেওড়ার আয়নায় রামকুমার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আরও কতো কিছুর উদ্ভট মূর্তি। ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র' (২০০৬) রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল সৃষ্টি। বস্তুতপক্ষে এটি একটি পত্র আখ্যান। তারাশঙ্করের পরে যাঁদের কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ মানুষের কথা বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই রামকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যে পরিচয় উঠে এসেছে তা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। মূলত রাঢ় বাংলা তাঁর আগ্রহের বিষয় এবং সেখানের লালমাটি লেখকের ভাবনার মূল আশ্রয়। তাঁর দু-তিনটি উপন্যাসের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার চালচিত্র লক্ষ্য করা যায়।

Keywords: অন্ত্যজ মানুষ, বাঁকুড়া জেলা, সংস্কৃতি, পত্র আখ্যান, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভারতবর্ষের গ্রাম, গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা।

এক

গত শতাব্দীর আটের দশক থেকে রামকুমার মুখোপাধ্যায় কথাসাহিত্যের এমন এক জগৎ খুলে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে যেদিকে চোখ রাখলে বোঝা যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের ইতিহাস-ভূগোল-রাজনীতি-সংস্কৃতির একটি বিরাট প্রসারিত ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে লোকায়ত জীবন। অন্ত্যজ মানুষকে নিয়ে তিনি যে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তা কথাসাহিত্যের সৃজন-বিশ্বে একেবারেই ভিন্ন স্বর-স্বরান্তের ব্যঞ্জনা দেয়। এখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা দশটির কম। তার মধ্যে তিনটি উপন্যাস দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার জনজীবন এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস ‘চারণে প্রান্তরে (১৯৯৩)। গরুর পাল নিয়ে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো রাখালিয়া জীবন নিয়ে রচিত এই উপন্যাস। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুর থানার মালিয়া গ্রাম ও তৎসন্নিহিত বড়দিঘি, রাজার গাঁ, কাঁকুড়ডাঙা, লোকপুর ইত্যাদি অঞ্চল এই উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত দুখে কেওড়া’ (২০০২) রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিনব উপন্যাস। ভৌগোলিক পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসাহের, তেঁতুলমুড়ি, গোঁড়াশোল, হরেরচক, ফুটিডাঙা, সলদা, নামছড়া ইত্যাদি গ্রাম।

ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র’ (২০০৬) রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল সৃষ্টি। বস্তুতপক্ষে এটি একটি পত্র আখ্যান। এক পক্ষ লিখে যাচ্ছে, যাকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠি লেখা, সে পেলেও পেতে পারে এই বিশ্বাসে অথবা এ সব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরের বিষয়। উপন্যাসটির জেলার পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার গেলিয়া গ্রাম। যদিও ঘটনা এই নির্দিষ্ট গ্রাম ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত লোকায়ত লোকসমাজের কথা শোনালেন। তার লেখায় উঠে এলো বেদে-লাঠিয়াল-মালাকার- চৌকিদার-কবিয়াল-সাপুড়ে ইত্যাদি মানুষের কথা। তারাশঙ্করের পরে যাঁদের কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ মানুষের কথা বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই রামকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যে পরিচয় উঠে এসেছে তা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। মূলত রাঢ় বাংলা তাঁর আগ্রহের বিষয় এবং সেখানের লালমাটি লেখকের ভাবনার মূল আশ্রয়। কথাযাত্রায় চার দশকের অধিককাল মগ্ন থাকলেও এখন পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি। তার মধ্যে দু-তিনটি উপন্যাসের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার চালচিত্র লক্ষ্য করা যায়।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস ‘চারণে প্রান্তরে’। একটি বা দুটি শিশুর সারল্যমধুর ছেলেবেলা থেকে বয়ঃপ্রাপ্তির রুঢ় পৃথিবীতে উত্তরণের বৃত্তান্ত। আবার, উপন্যাসটি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রাগত পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের নথি।

উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বিশু জন্মাবধি উৎপাদন প্রক্রিয়া বহির্ভূত পেশায় নিয়োজিত। অথচ ঠিক আগের প্রজন্মেও তাদের পরিবারে। বৃত্তিগত স্বাবলম্বন ছিল। আজ তাদের ‘তন্তুবায়’ পরিচয় ও তৎসংক্রান্ত সামাজিক রীতি নিষেধ রয়ে গেছে শুধু, পেশাগতভাবে বিশু রাখাল, আর তার মা-দিদি পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তির মাধ্যমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। বিশু গরুর পাল নিয়ে সকাল-বিকাল মাঠে যায়, মাসকাবারে কয়েক আনা পয়সা পারিশ্রমিক আদায় করতে বাড়ি-বাড়ি ছুটে বেদম হয়ে পড়ে। মাঝে-মধ্যে মালিকের অগোচরে কোনো বকনাকে ‘পাল’ ধরিয়ে কিছু পয়সা উপরি আসে। তার বাবার তাঁন ঘরে দিদি হাঁস পোষে, মনে স্বপ্ন দেখে একদিন ডিম বেচে পারিবারিক স্বাচ্ছল্য ফিরিয়ে আনবে। তার স্বপ্ন ভেঙে যায় অচিরেই। আর বিশুর কয়েক আনা পয়সার জীবিকাও কিন্তু নির্বিঘ্ন নয়, গরু চরানোর পেশাতেও প্রতিযোগিতা আছে। অবশ্য বিশু আপাতত বদে, জিতে, সুনো প্রমুখ প্রতিযোগীদের চেয়ে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, কেননা—

“বদে, জিতে, সুনোর মতো তার ঘর গাঁয়ের শেষ বলয়ে নয়। কেন্দ্র থেকে সে অনেকগুলো বলয় পেরিয়ে আসে। বলয়গুলোর গরু তার পালে এসে মেশে। সুনোরা প্রান্ত

থেকে গাঁয়ের মাঝে ঢুকে গরু আনতে পারে না।" (পৃ ১০)

—সুতরাং বিশুরা, দাসীরা আপাত-প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের আর্থ-সমাজ কাঠামোয় নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে অহর্নিশ আয়াসী।

অতীতের দুঃসহ স্মৃতিভার বহন করে চলে শুধু একাকিনী বিশুর মা। তারই চোখে পড়ে যায় বিশুর বাপের তাঁতের গর্তটা হাঁসের গুয়ে বুজে এসেছে। অথচ একদিন এই গর্তে পা ডুবিয়ে বসে থাকত বিশুর বাপ।

উপন্যাসের শেষে আর্থিকও মানসিকভাবে সর্বস্বান্ত বিশু আর গোপাল গাঁয়ের পথে ফেরে— গোপালকে ছেড়ে বিশু একাই এগোয়, তবু ফেরে সে-ও-তখনো তাদের বহমান জীবনধারা প্রতিনিয়ত অপেক্ষায় থাকে। দৈনন্দিনতার মধ্যে যে কোন শোকের সান্ত্বনা মেলে। অনেক সন্তাপময় কথা বুকের ভিতর জমিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি মুহূর্তের পরে বিশু ও গোপাল যে কীভাবে পুনর্বার দৈনন্দিনতায় লীন হয়ে যায়, সে অবশ্য 'চারণে প্রান্তরে'র অনুচ্চারণের অংশ বলে মনে করেন বিশিষ্ট সমালোচক—

"উচ্চারণের প্রাসঙ্গিকতা ও অনুচ্চারণের আধুনিকতা এই দুই শৈল্পিক কারণেই রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসটি সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।"[১]

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের এক অসাধারণ সৃষ্টি 'দুখে কেওড়া। প্রচলিত আখ্যান রীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দাপটের সঙ্গে রামকুমার টানা গল্প বলার পাট চুকিয়ে দিয়েছেন। পুরো উপন্যাসটি দুখের সংলাপ দিয়ে গড়া। দুখে কেওড়ার আয়নায় রামকুমার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আরও কতো কিছুর উদ্ভট মূর্তি।

দুখে কেওড়া প্রান্তবাসী মানুষ। একসময় কৃষিকাজই ছিল তার কাজ। বৃদ্ধ বয়সে শুরু করেছে দেশি মদের ব্যবসা। দুখে বা দুঃখহরণ— এর ঠেকে অনেকেই আসে। সেখানে বসেই দুখে তাদের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনায়। মতামত দেয়। রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি কিছুই বাদ পড়ে না তার কথা থেকে। প্রতিদিনের দেখা জীবনের বাস্তব প্রতিফলিত হয় দুখের কথায়। ব্যক্তি মানুষের জটিল সম্পর্ক ও অনুভূতি নিয়েও দুখে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে যায়।

প্রকৃত অর্থে দুখের বয়ানে ঔপন্যাসিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় দুখের জীবন নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেন। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব ভাষাশৈলী আছে, গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা আছে। গ্রামের মাটি ও মানুষ তার গল্পের বুননে লোকায়ত সংগীতের মতো প্রবাহিত হয়। রামকুমার অনায়াসে মানুষের মুখের গল্প, শাস্ত্রের গল্প, পুরাণকথা, উপকথা, গ্রামের ঘটনা-রটনা, প্রবাদ-প্রবচন গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।

সমগ্র উপন্যাসটি সংলাপের ফ্রেমে বাঁধা। ক্যানভাসে দুখের জীবনের ছবি। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের ছবি। ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের ছবি। দুখে কেওড়া প্রশ্ন তুলেছে, দুখে কেওড়াই উত্তর দিচ্ছে। ক্রমে ক্যানভাসে ফুটে উঠছে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসের ছবি— যে ইতিহাস রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি সম্পৃক্ত। দুখে কেওড়া উপন্যাসটিকে রামকুমার মুখোপাধ্যায় পরিচয়, ক্ষুধা, বাস্তু, স্বাস্থ্য, শ্রম, নারী, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবি, বিশ্ব, যুদ্ধ ও যুদ্ধ-এই বারোটি কাণ্ডে ভাগ করেছেন। এই কাণ্ড বা পর্বে ভাগ ভারতীয় রীতি। রামায়ণ মহাভারত থেকে এ পর্যন্ত চলে এসেছে। নতুন আঙ্গিকে নতুন

ব্যাখ্যায় রামকুমার কাজে লাগিয়েছেন এই উপন্যাসে।

দুখের জীবনদর্শনে নৈরাশ্য অবসাদ এসব বালাই তেমন নেই। কী কী পায়নি তার হিসেব সে কমই দিয়েছে বরং বেঁচে থাকার আনন্দে সে মশগুল। ফুলুকে নিয়ে যে অকিঞ্চন জীবন সে যাপন করছে তাতে দাম্পত্য সুখের কোনো ঘাটতি হয়নি। গ্রামপ্রান্তের খোড়োঘর, কাঁচির ব্যবসা, স্ত্রীর হাতে স্বাদু রান্না-স্বর্গেও এত যেন সুখ নেই। তাই দুখে কেওড়ার মনে হয়—

"একশ বছর পরমায়ু বড় কম। দেখতে দেখতে শীতের বিকেল গুটিয়ে গেল। ধরেন শত বছর হতে আমার আর ক বছরই বা বাকি। কিন্তু মনে হচ্ছে এই সেদিন দিঘিতে সাঁতার কেটেছি, গাছে উঠেছি, লোকের ঘরে মুনসি খাটতে গেছি। আয়ুখানি শ-দুই বছর হলে ভাল হত।"

বিশ্বায়ন আর ভোগবাদে হাবুডুবু এই দেশের আধুনিক নাগরিক এ ভেবেই পাবে না কীভাবে এই অদম্য জীবন তৃষ্ণা, সুস্থ বাসনা, বেঁচে থাকে হতদরিদ্র, শরীরের কাঠামোয়।

পুলিশ রূপে গভর্ণমেন্টকে চিনেছে দুখে এবং এ হেন গভর্ণমেন্টের হাতে ব্যাঙ্ক ইত্যাদি রাখার কোনও যুক্তি খুঁজে পায়নি। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লোন পাবার হুজ্জোত সে হাড়ে হাড়ে জানে। এমন দুর্ভেদ্য জায়গায় টাকা রেখে লাভ কী? লোকে খরা বা ঝরায় সে টাকার নাগাল পাবে কী করে? পাঁচটি ছাগল পোষার জন্য হাজার দুয়েক টাকা লোন চেয়েছিল দুখে। ব্যাঙ্ক আর পঞ্চায়েতে দৌড়াদৌড়ি করে দম ফুরিয়ে গেছে তার। টাকা মেলেনি। তাই দুখের মনে হয়— 'গবমেন্টকে বড়লোক করে কী লাভ— গবমেন্টের বিয়ে হয়, নাকি গবমেন্টের বউ পুয়াতি হয়।'

'ক্ষেতে মুনীষ' খাটা দুখে সময়ের পরাক্রমে ক্রমে ন্যুজ হয়ে আসে। বয়সের ভার তাকে অচল করে দেয় চাষের কাজে। তখন থেকে কাচির ব্যবসা শুরু। আর সেই সঙ্গে শুরু আত্ম রোমন্থন। জীবনের এ কোন সে কোন থেকে কুড়িয়ে আনা অভিজ্ঞতার ক্ষুদ-কুড়ো জমতে জমতে তখন পাহাড়। দুঃখহরণ থেকে দুখে হয়ে সে যেন আস্ত একখানা জীবন উপনিষদ। দুখের পাঠশালায় না পড়লে জানা হতো না যে দল আর পার্টি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ভোটাভুটির সঙ্গে পার্টির যোগ আর যাত্রার সঙ্গে দলের। এভাবেই বুদ্ধিজীবী আর বিদ্যাজীবীর পার্থক্যও সে জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছে। বিদ্বান হলেই কেউ বুদ্ধিজীবী হয় না। কলেজের অধ্যাপক বিদ্বান বিশু চৌধুরীকে ডাহা ঠকিয়ে ছ'বিঘা ডাঙা জমি কব্জা করে নিয়েছে বছর খানেক পাঠশালায় পড়া মদন রায়। বিদ্যা আর বুদ্ধি তবে এক হয় কী করে! জটিল পার্থক্য আলোচনা সূত্রেই বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অনবদ্য একটি মন্তব্য করে ফেলেছে। দুখে— 'বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আম-জনতার কোনো সম্বন্ধ নেই। শুধু আম কেনে, জাম, কাঁঠাল, বেল কোনো সম্বন্ধ নাই।'

দুখের কথকতায় অনায়াসে চলে আসে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথা, কিংবদন্তী, গোপাল ভাঁড়ের রঙ্গতামাসা, গ্রামের নানা সুখদুঃখের ঘটনা, রাজনৈতিক ঘটনা, তার ও ফুলির দাম্পত্যের টুকরো ছবি, নিমন্ত্রণ খাবার স্বাদু স্মৃতি, এমনকি নানা কেচ্ছাকাহিনি— সবই শোনা গল্প। এক ধরনের অভিনব 'শ্রুতি। যেহেতু কোনও নিদিষ্ট প্লটের অনুগত থাকার বাধ্যবাধকতা নেই, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে চায় দুখে-আড্ডার মেজাজ উপন্যাস চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ—

"এই উপন্যাস দেখায় একবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস ভাঙতে চাইছে তার

পরম্পরাকে- ইদানীং ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাঙালি তথা ভারতীয়দের উপন্যাস নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। তার পাশে এ উপন্যাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ।"[২]

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য দুটি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাঁকুড়ার দু'ই ভিন্ন ভিন্ন লোকায়ত সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে।

দুই

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দুখে কেওড়া' একটি অভিনব উপন্যাস। এই উপন্যাসে দুখে কেওড়ার মুখে আর্থ- সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় বাঁকুড়ার পূর্ব অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের। দুখের ক্যালেন্ডারের চালিকা শক্তি-খিদে—

"খিয়ে মিটবে কিসে? খুদে। খুদ ঘাঁটায় বেশ দম। দামেও সস্তা। আশ্বিনে আউস ধান উঠল। কাত্তিক মাসে ভাত খেলেন। অঘ্রাণ-পৌষে মাঠের ধান উঠল। ভাতে টান নাই। ফাগুন-চৈত অবদি সুখে গেল। বোশেখ থেকে ভাদর মাস হল গিয়ে টান মাস। খুদ খেলেন।" (পৃ. ৯-১০

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ বা ভাদ্র মাসে কাজ জোটে না তবে মানুষ তো আর বসে থাকতে পারে না, তখন চুরিচামারি।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'চারণে প্রান্তরে'। এই উপন্যাস স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের এক গড়পড়তা গ্রামের কথা শোনা যায়। এই গ্রামের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদি নানাভাবে বিপর্যস্ত। গ্রামীণ মানুষেরা তাদের ভেঙে পড়া বৃত্তিভিত্তিক সহজ কাঠামোটি অশক্ত কথামোটি এখানে বহন করে চলেছে। এ- উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ তাই অনবরত মানুষের পেশা বদলে যাওয়ার প্রসঙ্গগুলি উত্থাপিত হয়ে চলে।

উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বিশু পেশাগত ভাবে বিশু রাখাল। বিশু গরুর পাল নিয়ে সকাল-বিকাল মাঠে যায়, মাসকাবারে কয়েক আনা পয়সা পারিশ্রমিক আদায় করতে বাড়ি বাড়ি ছুটে বেদম হয়ে পড়ে। আর তার মা-দিদি পরের বাড়ি দাসীবৃত্তির মাধ্যমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তার বাবার তাঁত ঘরে দিদি হাঁস পোষে, মনে স্বপ্ন দেখে একদিন ডিম বেচে পারিবারিক সাচ্ছল্য ফিরিয়ে আনবে। বিশুর বাবার স্যাঙাত গোপাল বোষ্টমের বউ দূর গাঁয়ে -গাঁয়ে সেফটিপিন, গন্ধ তেল, হারিকেনের পলতে ইত্যাদি হরেক নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ফিরি করে বেড়ায়। গোপাল অবশ্য উৎপাদন- কাঠামোর বাইরে থেকেও স্বীয় জাতিগত কৌলীন্যের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় থাকে এমন সব পেশা খুঁজে নেয়। কখনো ঘটকগিরি করে, কখনো পুরীর পাণ্ডা হয়। এই আর্থ-সামাজিক রূপটি প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য—

"বিকৃত পুঁজিবাদী বিকাশের টানাপোড়েনে পর্যদস্ত হয়ে। যারা আর সরাসরি উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেনি, স্বাধীন দেশের আর্থ-সামাজিক বয়ানগুলির সীমানা বরাবর উৎপাদন-কাঠামোর বহিঃতলে জমে ওঠা শেওলার মতো কোনক্রমে যাপিত হয় যাদের দৈনন্দিন-সেইসব মানুষই এই উপন্যাসের প্রধান কুশীলব।"[৩]

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দুখে কেওড়া' উপন্যাসটি দুখে কেওড়ার জীবনের ধারাভাষ্য। এক সময়ের কৃষিমজুর দুখে এখন বৃদ্ধ, কাজ বলতে দেশি মদের ব্যবসা। সঙ্গে কাঠালবীচি পোড়া এবং আরো নানা ধরনের চাটের অনুপান থাকে। বউ বানায়, তার নাম ফুলু-তার। রান্নার হাতটি ভালো। লোক জমে মন্দ না। তার ভাষায়— 'আগে। মাঠে লোকের

মুনিস খাটতুম এখন গায়ে জোর নাই। কোমরে ব্যথা। আমরা মাগ-ভাতারে কাটির ব্যবসাটি করি। কাচি অর্থে দেশি মদ। অর্থাৎ হালিক থেকে দুখে হয়েছে শোণ্ডিক বা খুঁড়ি।। বাঁকুড়ার সংস্কৃতি।'

তিন

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'চারণে প্রান্তরে। বাঁকুড়া জেলার গোচারণভূমির রাখালিয়া জীবন ও জীবিকার সন্ধান পাওয়া যায়। কয়েকটি গান ব্যবহৃত হয়েছে নানা সময়ে নানা কণ্ঠে। সাপুড়িয়া কালো বাগদির কণ্ঠে সাপ খেলার গান শোনা যায়—

"কালী যারে চম্পাই নগর কেহ না খাইতে পারে বালা লখিন্দর
কালী যারে..." (পৃ. ১৭)

বৈশাখ মাসের শেষে ভোরে গ্রামে গোপাল বৈষ্টম নাম দিতে দিতে আসছে—

"রাই জাগো রাই জাগো
শুকসারী বলে কত নিদ্রা যাও হে কালো।
মানিকের কোলে।" (পৃ. ৫২)।

গানপাগল গোপাল চা দোকানে বসে সকালে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগিয়ে ঠাকুরের গান ধরে—

"প্রেমানন্দ সিংহাসন প্রেমরস বৃন্দাবন।
প্রেমানন্দ অমৃত লহর।
প্রেমানন্দ তরুমূল প্রেমানন্দ ফলফুল
প্রেমানন্দ রস মধুকর" (পৃ. ৬৫)।

গোপাল এককালে নিজেও গান বেঁধেছে। এক মহোৎসব থেকে আর-এক মহোৎসবে কৃষ্ণনাম গেয়ে বেড়িয়েছে। সে সব আজ বিশ তিরিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু ভাইঝি পারুলের বাড়িতে একখানা দুখানা করতে করতে সাতখানা গান গায় গোপাল। শেষ গানটায় সবার চোখে জল—

"গিরি কি অচল হলে আনিতে উমারে না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে।
ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করেছে ধরি,
উমা 'ওমা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে।" (পৃ. ৭১)

হঠাৎ যেন সেই ফেলে আসা দিনগুলো গলার ভেতর ঢুকে পড়ে। ভাইঝি পারুলকে ছেড়ে যেতে হবে। বিদেশ-বিভুঁয়ে গায়ের কাকা পিতৃত্বের কোন এক টান অনুভব করে। সুরে সেই কাতরতা লুকিয়ে ছিল। সেটাই ভাষার সমস্ত প্রাচীর ভেঙে দিয়ে চারপাশের মানুষজনের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। একটা বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। যে যার মতো করে এই বেদনাকে আকার দেয়—যে যার নিজস্ব সম্পর্কের নানান স্তরে।

'দুখে কেওড়া' (রামকুমার মুখোপাধ্যায়) এক অনবদ্য সৃষ্টি। দুখে কেওড়ার জবানীতে সময়-সমাজ-সংস্কৃতি উঠে এসেছে বাঁকুড়া জেলার। বিন্দে দাসীর কণ্ঠে অনেকগুলি গান ঔপন্যাসিক উদ্ধৃত করেছেন। বিদে দাসী পুথি পড়তে জানত না তবে শুনে শুনে মনে গেতে ফেলেছিল। গলাটি ছিল কোকিলের মতন। মধুর গীত গাইত—

"সে যে রসের পুতলী বালা করে মদনমোহন লীলা।

চেতন...” (পৃ. ৩৭)।

‘বিশ্ব’ মানে বড়। সাক্ষরতার সময় দুখে কেওড়াকে বলেছিল কোন মেয়ে জ্যাঠা, বই পড়লে তুমি জজ ব্যারিস্টার হতে। তখন মনের দুখে কেওড়া গেয়ে ওঠে—

“আর ভুলালে ভুলব না গো আমি অভয়-পদ সার করেছি।
ভয়ে হেলব দুলবো না গো।” (পৃ. ৬৯)

দুখে কেওড়া অবশ্য দুলছে, সাঁঝবেলার ভূমিকম্পে। তবে মনটি তার আর—

“বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে।
উব না গো সুখ দুঃখ ভেবে সমান,
মনের আগুন তুলব না গো।” (পৃ. ৬৯)।

বিশ্বপ্রেমিক কৃষ্ণ। অতগুলো গয়লানি নিয়ে কারবার প্রসঙ্গে দুখে কেওড়ার মনে পড়ে দরদভরা বিন্দে দাসীর গান—

“টাকা কড়ি আমি কিছু না চাই।
রতি সুখ দিয়া যাই গো রাই।”

গোপীর সঙ্গে গোপালের রতি হলো কিন্তু তাঁতিপাড়ার বিন্দের বিয়ে হলনি—

‘রাধার দুখে কেঁদে মলো বিন্দে,
নিজের দুখের কথা বলার
সময় পেলনি।
ভবের একী খেলা।’

এই বিন্দে দাসীর কণ্ঠেই আবার শোনা যায় জীবনের মোহ থেকে উত্তরণের রাস্তা—

“বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে,
ক্ষার হবে তায় পরিপাটি।
কর মনকে ধোলাই,
আপদ বালাই,
মনের ময়লা যাবে কাটি।” (পৃ. ৮৭)

Endnotes

১. চক্রবর্তী, অভিজিৎ: ‘অনুচ্চারণের চারণে প্রান্তরে”; রামকুমার মুখোপাধ্যায় কথাযাত্রার তিন দশক’; দীপঙ্কর মল্লিক, দেবারতি মল্লিক সম্পাদিত; দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা; ২০১৩; পৃ. ১২।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম: “দুখে কেওড়া এক অভিনব উপন্যাস, পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৭।
৩. চক্রবর্তী, অভিজিৎ: “অনুচ্চারণের চারণে প্রান্তরে”; পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭।

Bibliography

- চারণে প্রান্তরে’; রামকুমার মুখোপাধ্যায়: উখক প্রকাশনী; কলকাতা ৭০০০৬০: প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩।
- ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র’; রামকুমার মুখোপাধ্যায়: এবং মুশায়েরা; কলকাতা ৭০০০৭৩: প্রথম প্রকাশ ২০০৬।
- দুখে কেওড়া’; রামকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মুশায়েরা; কলকাতা ৭০০০৭৩: প্রথম এবং মুশায়েরা সংস্করণ, ২০০৬।